৭

ভারতের বিদেশনীতি

[Foreign Policy of India]

৭.১ ভারতের বিদেশনীতির প্রধান বৈশিষ্ট্যসমূহ :

Main Characteristics of India's Foreign Policy

আন্তর্জাতিক রাজনীতিতে ভারতের আবির্ভাব অপেক্ষাকৃত সাম্প্রতিক ঘটনা। স্বাধীনতা লাভের (১৯৪৭ সালের ১৫ আগস্ট) পর থেকে আজ পর্যন্ত এই অল্প কয়েক বছরের মধ্যে ভারত আন্তর্জাতিক রাজনীতিতে যথেষ্ট গুরুত্বপূর্ণ স্থান দখল করতে পেরেছে। শান্তিপূর্ণ সহাবস্থান নীতিতে আস্থাশীল থেকে বিশ্বশান্তি বজায় রাখার ক্ষেত্রে, নির্জোট আন্দোলনের শ্রেষ্ঠ প্রবক্তা হিসেবে, উপনিবেশবাদ, বর্ণবৈষম্যবাদ, আণবিক মারণাস্ত্রের প্রসার প্রভৃতি বিরোধিতার ক্ষেত্রে, সম্মিলিত জাতিপুঞ্জসহ প্রতিটি আন্তর্জাতিক মঞ্চে তৃতীয় বিশ্বের দাবি ও সমস্যা তুলে ধরার ক্ষেত্রে, উত্তর-দক্ষিণ আলোচনার ক্ষেত্রে, দক্ষিণ-দক্ষিণ সহযোগিতা বৃদ্ধির ক্ষেত্রে ভারত অগ্রণী ভূমিকা পালন করেছে।

যে সকল মৌলনীতির ওপর ভিত্তি করে ভারতের পররাষ্ট্রনীতি রচিত হয়েছে, সেগুলির পরিচয় পাওয়া যায় তদানীন্তন অন্তর্বর্তী সরকারের প্রধান হিসেবে **জওহরলাল নেহেরু** কর্তৃক জাতির উদ্দেশ্যে প্রদত্ত একটি বেতার ভাষণ থেকে (১৯৪৬ সালের ৭ সেপ্টেম্বর)। উক্ত ভাষণে ভারতের পররাষ্ট্রনীতির মূল ৭টি নীতি প্রকাশ পায়, যথা—(১) স্বাধীনতা ও বিশ্বশান্তির প্রসারে অন্যান্য দেশের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ সহযোগিতার সম্পর্ক স্থাপন করা ; (২) বিভিন্ন শক্তিজোট থেকে নিজেকে দূরে রাখা ; (৩) ঔপনিবেশিক শক্তির বিরুদ্ধে সমস্ত প্রকার আন্দোলনকে সক্রিয়ভাবে সাহায্য করা ; (৪) বর্ণবিদ্বেষবাদকে নির্মূল করা ; (৫) ইংল্যান্ড ও কমনওয়েলথ অব নেশনস্-এর সঙ্গে বন্ধুত্বপূর্ণ ও সহযোগিতার সম্পর্ক রক্ষা ; (৬) মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও সোভিয়েত ইউনিয়ন—উভয়ের সঙ্গে সুসম্পর্ক বজায় রাখা ; (৭) এশীয় দেশগুলির সঙ্গে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক স্থাপন করা।

উপরিউক্ত নীতিগুলির সাথে সামঞ্জস্য রক্ষা করে ভারতে যে পররাষ্ট্রনীতিটি গড়ে উঠেছে, তার প্রধান বৈশিষ্ট্যগুলি নিম্নলিখিতভাবে বর্ণনা করা হল :

(১) পঞ্চশীল : ভারতের বৈদেশিক নীতির অন্যতম প্রধান বৈশিষ্ট্য হল পঞ্চশীলনীতির অনুসরণ। ইন্দোনেশিয়ার **'পঞ্চৎ শিলা'** (Panjat Shila)-র অনুকরণে ১৯৪৫ সালে তদানীন্তন ভারতের প্রধানমন্ত্রী জওহরলাল নেহেরু সর্বপ্রথম 'পঞ্চশীলা'-এর কথা ঘোষণা করেন। নেহেরু বলেন, শান্তিপূর্ণ উপায়ে ভারত তার নবার্জিত স্বাধীনতাকে সুরক্ষিত করার উদ্দেশ্যে ৫টি নীতি অনুসরণ করবে। এই ৫টি নীতিই 'পঞ্চশীল' নামে পরিচিত। পঞ্চশীলের ৫টি নীতি হল—(১) প্রতিটি রাষ্ট্রের ভৌগোলিক অখণ্ডতা ও সার্বভৌমত্বের প্রতি পারস্পরিক শ্রদ্ধা প্রদর্শন ; (২) অনাক্রমণ (Non-aggression) ; (৩) অন্য রাষ্ট্রের অভ্যন্তরীণ বিষয়ে হস্তক্ষেপ না করা ; (৪) সাম্য ও পারস্পরিক সাহায্য এবং (৫) শান্তিপূর্ণ সহাবস্থান (Peaceful Co-existence)। পঞ্চশীলনীতির প্রথম আনুষ্ঠানিক স্বীকৃতি ঘটে ১৯৫৪ সালে ভারতের প্রধানমন্ত্রী নেহেরু ও চিনের প্রধানমন্ত্রী চৌ-এন-লাই কর্তৃক সম্পাদিত চুক্তির প্রস্তাবনায়। পরবর্তীকালে এই নীতির প্রতিফলন ঘটে ভিয়েতনাম, মায়ানমার, যুগোশ্লাভিয়া, নেপাল, সোভিয়েত ইউনিয়ন প্রভৃতি দেশের সঙ্গে ভারতের চুক্তির ক্ষেত্রে। এ ছাড়া বান্দুং সম্মেলন, আফ্রো-এশীয় সম্মেলন, জোটনিরপেক্ষ দেশগুলির সম্মেলন, জাতিপুঞ্জের অধিবেশন— প্রভৃতি বিভিন্ন ক্ষেত্রে ভারত তার পঞ্চশীলনীতির প্রতি দৃঢ় আস্থার কথা ব্যক্ত করে।

পঞ্চশীলের সাফল্য সম্পর্কে ভারত খুব বেশি আশাবাদী হয়ে পড়েছিল। দুর্ভাগ্যের বিষয় সেই আশাবাদ দীর্ঘস্থায়ী হয়নি। পঞ্চশীলনীতির ভিত্তিতে সম্পাদিত ভারত-চিন চুক্তির কালি শুকিয়ে যেতে না-যেতেই উভয় দেশের মধ্যে বিরোধ মাথা চাড়া দিয়ে ওঠে, যা শেষ পর্যন্ত ১৯৬২ সালে ভারত-চিন যুদ্ধে পরিণতি লাভ করে।

(২) জোট নিরপেক্ষতা : ভারতের পররাষ্ট্রনীতির অন্যতম প্রধান স্তম্ভ হল জোটনিরপেক্ষতা। জোটনিরপেক্ষতা হল বিশ্বের কোনো শক্তিজোটের সঙ্গে যুক্ত না থেকে শান্তিপূর্ণ ও স্বাধীনভাবে পররাষ্ট্রনীতি নির্ধারণ করা। তবে জোটনিরপেক্ষ নীতি অবলম্বন করলেও ভারত যুদ্ধ ও শান্তির প্রশ্নে নিষ্ক্রিয় থাকেনি, আন্তর্জাতিক বিরোধ অথবা সমস্যা থেকে নিজেকে বিচ্ছিন্ন রাখেনি। জোটনিরপেক্ষ হয়েও ভারত যুদ্ধ, আগ্রাসন, সামরিক ঘাঁটি স্থাপন, ঔপনিবেশিকতা, সাম্রাজ্যবাদ, অস্ত্রসজ্জা প্রভৃতির বিরুদ্ধে বিভিন্ন সময়ে সরব হয়েছে।

(৩) সাম্রাজ্যবাদ বিরোধিতা : ভারতের পররাষ্ট্রনীতির একটি উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য হল সাম্রাজ্যবাদ বিরোধিতা। ভারত একদিকে পৃথিবীর বিভিন্ন প্রান্তে সাম্রাজ্যবাদী শক্তির বিরুদ্ধে অনুষ্ঠিত জাতীয় মুক্তি আন্দোলনকে সমর্থন জানিয়েছে, অন্যদিকে সাম্রাজ্যবাদী শক্তিগুলির আগ্রাসী নীতির কঠোর সমালোচনা করেছে। এল সালভাডোর, নিকারাগুয়া, ফকল্যান্ড দীপপুঞ্জ, ভিয়েতনাম, কোরিয়া, পানামা প্রভৃতি রাষ্ট্রে সাম্রাজ্যবাদী শক্তির হস্তক্ষেপকে ভারত তীব্রভাবে বিরোধিতা করেছে।

(৪) নয়া-উপনিবেশবাদ বিরোধিতা : নয়া-উপনিবেশবাদ হল সাম্রাজ্যবাদের নতুন রূপ। সামরিক জোট গঠন, সামরিক ঘাঁটি স্থাপন, বৈদেশিক সাহায্য ও ঋণদান, অস্ত্র বিক্রয়, বিদেশে পুতুল-সরকার গঠন, অভ্যন্তরীণ ক্ষেত্রে হস্তক্ষেপ, নাশকতামূলক কার্যকলাপে উৎসাহদান, বৈদেশিক বাণিজ্য নিয়ন্ত্রণ, ষড়যন্ত্র ও গুপ্তহত্যার মধ্য দিয়ে সরকারের পতন ঘটানো প্রভৃতি নতুন নতুন কৌশল প্রয়োগ করে নয়া-উপনিবেশবাদ অনুন্নত ও উন্নয়নশীল দেশগুলিকে নানাভাবে শোষণ ও নিয়ন্ত্রণ করে। ভারত এই নয়া-উপনিবেশবাদের বিরুদ্ধে বিভিন্ন ক্ষেত্রে সোচ্চার হয়েছে। আন্তর্জাতিক শীর্ষ সম্মেলনে, নির্জোট আন্দোলনের শীর্ষ বৈঠকে, জাতিপুঞ্জের বিভিন্ন সংস্থায় এবং অন্যত্র ভারত নয়া-উপনিবেশবাদকে আক্রমণ করেছে।

(৫) জাতীয় মুক্তি আন্দোলনকে সমর্থন : পরাধীনতার যন্ত্রণাভোগের দীর্ঘ অভিজ্ঞতাকে সম্বল করে ভারত এশিয়া, আফ্রিকা, লাতিন-আমেরিকায় জাতীয় মুক্তি আন্দোলনগুলিকে সর্বতোভাবে সমর্থন করেছে। দক্ষিণ রোডেশিয়া, ইন্দোনেশিয়া, ঘানা, উগান্ডা, অ্যাঙ্গোলা, মোজাম্বিক, বাংলাদেশ প্রভৃতি দেশে জাতীয় মুক্তি আন্দোলনের প্রতি ভারত অকুণ্ঠ সমর্থন জানিয়েছে ও সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দিয়েছে।

(৬) বর্ণবৈষম্যের বিরোধিতা : ভারতের পররাষ্ট্রনীতির একটি অপরিহার্য বৈশিষ্ট্য হল এর একনিষ্ঠ বর্ণবৈষম্যবাদ বিরোধিতা। দক্ষিণ আফ্রিকা, দক্ষিণ রোডেশিয়া প্রভৃতি দেশের শ্বেতাঙ্গ সরকারের বর্ণবৈষম্য নীতিকে ভারত কঠোরভাবে সমালোচনা করেছে। জাতিপুঞ্জ থেকে দক্ষিণ আফ্রিকার বহিষ্কারে ভারতের ভূমিকা সর্বজনবিদিত। বর্ণবাদের বিরুদ্ধে লড়াই করার ক্ষেত্রে ভারত জোটনিরপেক্ষ আন্দোলন, কমনওয়েলথ সম্মেলন, সম্মিলিত জাতিপুঞ্জ প্রভৃতি মঞ্চগুলিকে সার্থকভাবে ব্যবহার করেছে।

(৭) নিরস্ত্রীকরণ : ভারত মনে করে বিশ্বশান্তি ও নিরাপত্তা প্রতিষ্ঠার পথে অন্যতম প্রধান প্রতিবন্ধকতা হল মারাত্মক যুদ্ধাস্ত্র উৎপাদন ও আণবিক মারণাস্ত্রের প্রসার। তাই সে নিজে মারাত্মক যুদ্ধাস্ত্র উৎপাদন থেকে বিরত থেকেছে, নিরস্ত্রীকরণের পক্ষে আন্দোলন করেছে এবং আণবিক মারণাস্ত্রের প্রসার রোধে তৎপর হয়েছে। প্রসঙ্গত, ভারত শান্তির উদ্দেশ্যে আণবিক শক্তির ব্যবহারকে সমর্থন করে।

(৮) বিশ্বশান্তি : ভারত শান্তির পূজারী এবং যুদ্ধের বিরোধী। স্বাভাবিকভাবেই ভারতের পররাষ্ট্রনীতির মূল স্লোগান হল—'যুদ্ধ নয়, শান্তি চাই'। কোরিয়া যুদ্ধ, ভিয়েতনাম যুদ্ধ, আরব-ইসরায়েল যুদ্ধ, ইরাক-ইরান যুদ্ধ—প্রভৃতি যুদ্ধের অবসানে ভারত সক্রিয় ভূমিকা নিয়েছে। দুঃখের বিষয়, বিশ্বশান্তির একনিষ্ঠ পূজারী হওয়া সত্ত্বেও ভারতকে বিভিন্ন কারণে বিভিন্ন সময়ে পাকিস্তান, চিন প্রভৃতি প্রতিবেশী রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে যুদ্ধে জড়িয়ে পড়তে হয়েছে।

(৯) অন্যান্য : ভারতের পররাষ্ট্রনীতির অপরাপর বৈশিষ্ট্যগুলি হল প্রতিবেশী রাষ্ট্রের সঙ্গে সুসম্পর্ক বজায় রাখা, সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের ওপর আস্থা রাখা, তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলির প্রতি সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দেওয়া, আন্তর্জাতিক বিরোধের শান্তিপূর্ণ মীমাংসায় উদ্যোগ নেওয়া ইত্যাদি।

সমালোচনা : ভারতের পররাষ্ট্রনীতিকে নানাভাবে সমালোচনা করা হয়। সমালোচকদের মতে, জোটনিরপেক্ষতা ভারতের বৈদেশিক নীতির প্রধান স্তম্ভ হলেও, ভারত এই নীতি অনুসরণের ক্ষেত্রে ধারাবাহিকতা বজায় রাখতে ব্যর্থ হয়েছে। উদাহরণস্বরূপ, ১৯৬৫ সালের ভিয়েতনাম যুদ্ধে ভারত ভিয়েতনামের ওপর মার্কিন আক্রমণের নিন্দা করলেও, ১৯৬৮ সালে চেকোশ্লাভাকিয়াতে সোভিয়েত সামরিক হস্তক্ষেপের ব্যাপারে, অথবা ১৯৮০ সালে আফগানিস্তানের ব্যাপারে সোভিয়েত হস্তক্ষেপের বিরুদ্ধে ভারত নীরব থাকে। অনুরূপভাবে ১৯৫৬ সালের সুয়েজ সমস্যায় ভারত ইজিপ্টের ওপর ইঙ্গ-ফরাসি আক্রমণের তীব্র বিরোধিতা করলেও, হাঙ্গেরিতে সোভিয়েত আক্রমণের বিরুদ্ধে একটি কথাও খরচ করেনি।

সমালোচকদের মতে, ভারত মুখে জোটনিরপেক্ষতার কথা বললেও, আন্তর্জাতিক রাজনীতিতে তার ভূমিকা বরাবরই **পক্ষপাতমূলক**। যতদিন সোভিয়েত ইউনিয়ন শক্তিশালী ছিল, ততদিন ভারত সোভিয়েত ইউনিয়নের পক্ষে কাজ করেছে ; আবার ১৯৯১ সালে সোভিয়েত ইউনিয়ন তথা সমাজতান্ত্রিক দেশগুলির বিপর্যয়ের পর বিশ্বরাজনীতিতে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের একাধিপত্য প্রতিষ্ঠিত হলে ভারত মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের দিকে ঢলে পড়ে। উপসাগরীয় যুদ্ধে ইরাকের ওপর মার্কিন সেনাবাহিনীর বর্বরোচিত আচরণের বিরুদ্ধে, ওসামা বিন লাদেনকে খুঁজে বের করার নাম করে আফগানিস্তানের ওপর মার্কিন সেনাবাহিনীর অমানবিক ক্রিয়াকলাপের বিরুদ্ধে অথবা যুগোশ্লাভিয়ার ওপর 'ন্যাটো' বাহিনীর অনৈতিক আক্রমণের বিরুদ্ধে ভারত নীরব দর্শকের ভূমিকা পালন করেছে।

এছাড়া সমালোচকেরা ভারতে বিদেশনীতির মধ্যে নানান **স্ববিরোধিতা** লক্ষ করে থাকেন। ভারত নামিবিয়ার স্বাধীনতার জন্য রাষ্ট্রপুঞ্জের প্রস্তাবকে সমর্থন করে, অথচ কাশ্মীর প্রশ্নে কোনো দেশ রাষ্ট্রপুঞ্জে প্রস্তাব উত্থাপনের কথা তুললেই ভারত বেজায় চটে যায়। ভারত দক্ষিণ আফ্রিকার বর্ণবৈষম্যনীতির বিরুদ্ধে নিন্দায় মুখর হয়, আবার অন্যদিকে নিজের দেশেই 'বর্ণবৈষম্য ও জাতপাতের নির্লজ্জ রাজনীতি চালিয়ে যায়'। ভারত একদিকে পরমাণু অস্ত্র উৎপাদন ও পারমাণবিক অস্ত্র পরীক্ষা নিষিদ্ধ করার জন্য জাতিপুঞ্জের ভিতরে ও বাইরে প্রয়াস চালায়, অথচ কখনও শান্তির নামে কখনও আত্মরক্ষার নামে পারমাণবিক বোমা বানায় এবং তার বিস্ফোরণ ঘটায়। ভারত নিরস্ত্রীকরণের পক্ষে প্রয়াস চালায়, অথচ বৈষম্যের অজুহাত দেখিয়ে পারমাণবিক অস্ত্র-প্রসার রোধ চুক্তি (NPT) অথবা সার্বিক পারমাণবিক অস্ত্র-পরীক্ষা রোধ চুক্তি (CTBT)-তে স্বাক্ষরদান থেকে বিরত থাকে। ভারত মুখে শান্তিপূর্ণ সহাবস্থানের কথা বলে, অথচ পাকিস্তান, শ্রীলঙ্কা, চিন, নেপাল, ভুটান, মায়ানমার প্রভৃতি প্রতিবেশী রাষ্ট্রের সঙ্গে সুসম্পর্ক বজায় রাখতে চায় না বা পারে না। এরজন্য অনেকে ভারতের 'দাদাগিরি মনোভাব'কে দায়ী করেন।

সমালোচকরা ভারতের বিদেশনীতির বিরুদ্ধে **সম্প্রসারণশীলতার** অভিযোগও তোলেন। তাঁদের মতে, উত্তর সীমান্তবর্তী সিকিম রাজ্যকে ভারতের অন্তর্ভুক্ত করে ভারত তার সম্প্রসারণশীল মানসিকতার পরিচয় দিয়েছে। শ্রীলঙ্কার আহ্বান ছাড়াই ভারত বারবার শ্রীলঙ্কার ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করেছে। শ্রীলঙ্কার অভিযোগ, সেদেশে গোলমালের পিছনে পূর্বতন সোভিয়েত ইউনিয়ন, জার্মানি ও ভারতের মদত ছিল।

সমালোচকেরা আরও বলেন, ভারত সুযোগ পেলেই মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সমালোচনা করে, কিন্তু সেই মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের কাছেই ভারতকে বারবার আত্মসমর্পণ করতে হয়। এই প্রসঙ্গে ১৯৮৬ সালের ২৯ মার্চ আনন্দবাজার পত্রিকায় প্রকাশিত সম্পাদকীয়তে **সুনীত ঘোষের** একটি মন্তব্য উদ্ধৃত করা হয়ে যেতে পারে : "মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের বিরুদ্ধে কড়া কথা বলা আমাদের সরকারের এক প্রকার বিলাস। অথচ বিপদে পড়লে আমাদের নেতারা যে 'প্রতিক্রিয়ার দুর্গ' মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের শরণাপন্ন হন, সে তো ঐতিহাসিক সত্য।"

উপসংহার : ভারতের পররাষ্ট্রনীতির বিরুদ্ধে যেসব অভিযোগ (পক্ষপাতিত্ব, স্ববিরোধিতা, সম্প্রসারণশীলতা, ভণ্ডামি ইত্যাদি) আনা হয়, সেগুলি যে ভিত্তিহীন তা বলা যাবে না। তবে আন্তর্জাতিক রাজনীতিতে এ ধরনের আচরণ অস্বাভাবিক কিছু নয়। ভারত কেন, পৃথিবীর যে-কোনো দেশের বৈদেশিক নীতিতে কিছু পরিমাণ স্ববিরোধিতা, পক্ষপাতিত্ব ইত্যাদি লক্ষ করা যায়। আসলে বাস্তব দৃষ্টিভঙ্গি থেকে বিচার করলে দেখা যায়, যে-কোনো দেশের বিদেশনীতি পরিচালিত হয় জাতীয় স্বার্থের দ্বারা। জাতীয় স্বার্থের খাতিরে ভারত জোটনিরপেক্ষ নীতির আশ্রয় নিয়েছে, আবার সময় বিশেষে সোভিয়েত জোট অথবা মার্কিন জোটের পক্ষ অবলম্বন করেছে ; জাতীয়

স্বার্থের খাতিরেই ভারত বিভিন্ন আন্তর্জাতিক সমস্যায় কোনো কোনো দেশের বিরুদ্ধে সরব হয়েছে, আবার কখনো কখনোও নীরব থেকেছে ; জাতীয় স্বার্থের খাতিরে ভারত আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে শান্তি চেয়েছে, আবার পাকিস্তান, চিন প্রভৃতি দেশের বিরুদ্ধে যুদ্ধে লিপ্ত হয়েছে। বর্তমানে ভারত যে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রকে কিছুটা তোষণ করার নীতি নিয়ে চলছে, তা এই জাতীয় স্বার্থ তথা আন্তর্জাতিক পরিস্থিতির কথা বিবেচনা করেই।

৭.২ ভারতের পররাষ্ট্রনীতির প্রধান স্তম্ভস্বরূপ জোট-নিরপেক্ষতা

বাড়বে। আশা করা যায় অদূর ভবিষ্যতে দু-দেশের মধ্যে সমস্ত ভুল বোঝাবুঝির ও প্রতিদ্বন্দ্বিতার অবসান ঘটবে এবং উভয় দেশ পরস্পরের কাছাকাছি আসবে।

৭.৬ ভারত ও পাকিস্তানের মধ্যে সম্পর্ক

The Relation between India and Pakistan

ভারত ও পাকিস্তান হল এশিয়া মহাদেশের দুই প্রতিবেশী দেশ। অথচ ১৯৪৭ সালের স্বাধীনতার সময় থেকেই পাকিস্তান ভারতের সবচেয়ে 'দূরবর্তী প্রতিবেশী' ('Distant neighbour')-তে পরিণত হয়েছে—ভৌগোলিক দিক থেকে নয়, সম্পর্কের দিক থেকে। জন্মলগ্ন থেকেই ভারত-পাকিস্তান সম্পর্ক বিদ্বেষ, সন্দেহ ও বিবাদে আচ্ছন্ন থেকেছে। **মাইকেল ব্রেচার** (Michael Brecher) ভারত-পাকিস্তান সম্পর্ককে অঘোষিত যুদ্ধের অবস্থা ("A state of undeclared war") বলে অভিহিত করেছেন। স্বাধীনতা অর্জনের মাত্র দুমাসের মধ্যেই কাশ্মীর নিয়ে ভারত-পাকিস্তানের মধ্যে অঘোষিত যুদ্ধের সূত্রপাত। সেই যুদ্ধ আজও চলছে, কখনও তীব্র কখনও প্রশমিত অবস্থায়।

ভারত-পাকিস্তানের মধ্যে এই বৈরীমূলক সম্পর্কের মূলে আছে দু-দেশের দৃষ্টিভঙ্গির মধ্যে তফাত। ভারত যেক্ষেত্রে ধর্মনিরপেক্ষতার আদর্শ গ্রহণ করেছে, সেক্ষেত্রে পাকিস্তান প্রথম থেকেই নিজেকে ইসলামিক রাষ্ট্র বলে ঘোষণা করেছে। ভারত সংসদীয় গণতন্ত্রকে গ্রহণ করেছে, পাকিস্তান সেক্ষেত্রে সামরিক শাসনকে প্রাধান্য দিয়েছে। ভারত জোটনিরপেক্ষ নীতি গ্রহণ করেছে, পাকিস্তান সেখানে পশ্চিমি জোটের সঙ্গে গাঁটছড়া বেঁধেছে। **ভি পি দত্ত** তাঁর *India's Foreign Policy* গ্রন্থে মন্তব্য করেছেন, ভারত-পাকিস্তানের মধ্যে সুসম্পর্ক প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে 'সমস্যাগুলি খুবই জটিল, দৃষ্টিভঙ্গিও বিপরীত, পারস্পরিক ঈর্ষা, সন্দেহ, অবিশ্বাস অত্যন্ত গভীর এবং লক্ষ্যগুলিও পরস্পর বিরোধী।' তিনি আরও বলেন এই দৃষ্টিভঙ্গিগত পার্থক্যই উভয় দেশের মধ্যে প্রতিযোগিতা, উদ্‌বেগ ও আশঙ্কার সূচনা করেছে।

আগেই বলা হয়েছে, ভারত-পাকিস্তানের মধ্যে শত্রুতার সূচনা কাশ্মীর সমস্যাকে কেন্দ্র করে। ভারত ও পাকিস্তানের জন্মের আগে জম্মু ও কাশ্মীর ছিল ব্রিটিশ শাসনাধীন করদ রাজ্যগুলির মধ্যে বৃহত্তম। ভারত-পাকিস্তান জন্মের সময় জম্মু-কাশ্মীরের মহারাজা এ দুটি রাষ্ট্রের মধ্যে কোনোটিতে যোগদান করতে চাননি। তিনি চেয়েছিলেন জম্মু-কাশ্মীরের স্বতন্ত্র অস্তিত্ব রক্ষা করতে। কিন্তু কাশ্মীর দখল করার জন্য পাকিস্তান উপজাতিভুক্ত হানাদারদের ছদ্মবেশে পাক সেনাবাহিনীকে কাশ্মীরে অনুপ্রবেশের ব্যবস্থা করে। পরে পাক হানাদার ও সেনাবাহিনীর সঙ্গে ভারতীয় সেনাবাহিনীর তুমুল যুদ্ধ বাধে। শেষ পর্যন্ত জাতিপুঞ্জের মধ্যস্থতায় যুদ্ধবিরতি ঘটে। যুদ্ধবিরতির ফলে

পাক সেনাবাহিনী যে অংশ দখল করে নিয়েছিল সেই অংশ পাকিস্তানের দখলে চলে যায় এবং এখনো পর্যন্ত সেই অংশ পাকিস্তানের দখলেই রয়েছে।

১৯৬৫ সালে পাকিস্তান সেই যুদ্ধবিরতি রেখা অতিক্রম করলে পুনরায় পাক-ভারত যুদ্ধ শুরু হয়ে যায়। এবারও জাতিপুঞ্জের মধ্যস্থতায় যুদ্ধবিরতি ঘটে। পাকিস্তান চায় কাশ্মীর গণভোটের মাধ্যমে স্থির করুক তারা পাকিস্তানের সঙ্গে যোগ দিতে চায়, না ভারতের সঙ্গে থাকতে চায়। গণভোটের প্রস্তাব ভারতই প্রথম উত্থাপন করেছিল। কিন্তু পরিস্থিতির চাপে ভারতকে সেই প্রস্তাব থেকে সরে আসতে হয়। যাইহোক পাকিস্তান এই গণভোটের ইস্যুটিকে সম্বল করে কখনও সম্মিলিত জাতিপুঞ্জে, কখনও আন্তর্জাতিক সম্মেলনে ভারতকে বিব্রত করার চেষ্টা করে গেছে।

ভারত-পাক বিরোধের ক্ষেত্রে কাশ্মীর সমস্যা ছাড়াও অন্যান্য কারণ আছে। উদাহরণস্বরূপ, বিভিন্ন নদীর জলবণ্টনকে কেন্দ্র করে উভয় দেশের মধ্যে বিরোধ বাধে। ১৯৪৮ সালে এক চুক্তি অনুসারে পাকিস্তানকে কয়েকটি নদীর জল ব্যবহারের সুযোগ দেয় ভারত। পরিবর্তে পাকিস্তানেরও সংযোগকারী খাল খনন করার কথা ছিল। তা না করায় পাকিস্তানের সঙ্গে ভারতের তিক্ততা শুরু হয়। অতঃপর ১৯৫৩ সালে ভাকরা নাঙ্গাল বাঁধকে কেন্দ্র করে এবং ১৯৬০ সালে বিশ্বব্যাঙ্কের মধ্যস্থতায় সিন্ধু, ঝিলম, শতদ্রু, বিয়াস প্রভৃতি নদীকে কেন্দ্র করে উভয় দেশের মধ্যে চুক্তি হয়। বলাবাহুল্য পরবর্তীকালে এসব ক্ষেত্রেও দু-দেশের মধ্যে বিবাদ বাধে।

ভারত-পাক বিরোধের অপর একটি কারণ **সীমান্ত বিরোধ**। ১৯৫৮ সালে গুজরাটের কচ্ছ অঞ্চলকে কেন্দ্র করে ভারত-পাকিস্তানের মধ্যে একটি চুক্তি হয়। পাকিস্তান চুক্তির শর্ত ভঙ্গ করে জোর করে কচ্ছের রান অঞ্চলের বিরাট অংশ দখল করে নিলে উভয়পক্ষের মধ্যে বিরোধ বাধে। ১৯৬৬ সালে তাসখন্দ চুক্তির মাধ্যমে এই বিরোধ-মীমাংসার দায়িত্ব আন্তর্জাতিক ট্রাইব্যুনালের ওপর ন্যস্ত করা হয়। ট্রাইব্যুনাল সংশ্লিষ্ট অঞ্চল সম্পর্কে ভারতের দাবির ৯০ শতাংশ মেনে নেয়।

পাকিস্তানের নিরন্তর সমরসজ্জাও (Armament) ভারত-পাকিস্তানের মধ্যে উত্তেজনা ও অবিশ্বাসের বাতাবরণ সৃষ্টি করেছে। নিজেকে সমরাস্ত্রে বলীয়ান করার উদ্দেশ্যে পাকিস্তান পশ্চিমি জোটের সঙ্গে যুক্ত হয়েছে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রও চেয়েছে ভারত-পাকিস্তানের মধ্যে বিরোধের পরিস্থিতি বজায় রাখতে, যাতে তার অস্ত্র বিক্রির ব্যাবসা অব্যাহত থাকে।

ভারতের অভ্যন্তরে অনুষ্ঠিত সন্ত্রাসবাদী ও উগ্রপন্থী কার্যকলাপকে কেন্দ্র করেও দু-দেশের মধ্যে সম্পর্ক তিক্ত হয়েছে। ভারতের অভিযোগ, পাকিস্তান ভারতের অভ্যন্তরে সন্ত্রাসবাদী ও উগ্রপন্থী কার্যকলাপে ইন্ধন জুগিয়েছে, নাগা ও মিজো বিদ্রোহীদের অর্থ ও অস্ত্র সরবরাহ করেছে, পাঞ্জাবে উগ্রপন্থীদের অস্ত্রশস্ত্র সরবরাহ করেছে এবং প্রশিক্ষণ দিয়েছে। এ ছাড়া কাশ্মীরের উগ্রপন্থীরা তো পাকিস্তানের কাছ থেকে সর্বতোভাবে সাহায্য পাচ্ছে।

১৯৭১ সালে বাংলাদেশ **মুক্তিযুদ্ধকে** কেন্দ্র করে ভারত-পাকিস্তানের মধ্যে বিরোধ চূড়ান্ত পর্যায়ে পৌঁছায় ও শেষ পর্যন্ত তা যুদ্ধের আকার ধারণ করে। যুদ্ধে পাকিস্তানের পরাজয় ঘটে এবং ভারতের হস্তক্ষেপে বাংলাদেশ নামক স্বাধীন রাষ্ট্রের জন্ম হয়।১৯৭২ সালের ২ জুলাই ভারত-পাকিস্তানের মধ্যে **সিমলা চুক্তি** স্বাক্ষরিত হওয়ার ফলে দু-দেশের সম্পর্ক কিছুটা উন্নত হয়। সিমলা চুক্তির মধ্য দিয়ে ভারত ও পাকিস্তান সমস্ত সমস্যা দ্বিপাক্ষিক আলোচনার মাধ্যমে নিষ্পত্তির জন্য সম্মত হয়।

১৯৭৪ সালে ভারত ভূগর্ভে পরীক্ষামূলক **আণবিক বিস্ফোরণ** ঘটায়। ভারতের তরফ থেকে আণবিক শক্তিকে কেবলমাত্র শান্তিপূর্ণ উদ্দেশ্যে ব্যবহার করার প্রতিশ্রুতি দেওয়া হলেও পাকিস্তান এই ঘটনাকে যথেষ্ট উদ্‌বেগজনক বলে মন্তব্য করে। পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী ভুট্টো ভারতের এই 'আণবিক ব্ল্যাকমেল' সহ্য করবে না বলে হুমকি দেন।

১৯৯০ সালের জানুয়ারিতে পাকিস্তান ভারতের বিরুদ্ধে তীব্র কূটনৈতিক তৎপরতা শুরু করে। ভারত সীমান্তে নতুন সৈন্য সমাবেশের ফলে উভয় দেশের মধ্যে উত্তেজনার সৃষ্টি হয়। ১০ ফেব্রুয়ারি বেনজির ভুট্টো পাক সংসদে ঘোষণা করলেন যে কাশ্মীরের আত্মনিয়ন্ত্রণের প্রশ্নে পাকিস্তান কোনো আপস করবে না। ১৯৯৪ সালের ১—৩ জানুয়ারি তিনদিনব্যাপী দু-দেশের মধ্যে সচিব পর্যায়ে বৈঠক হল। কিন্তু কাশ্মীর ও অন্যান্য অনেক বিষয়ে মতপার্থক্য থেকেই গেল।

১৯৯৬ সালের ৪ জুন পাক প্রধানমন্ত্রী বেনজির ভুট্টো ভারতের প্রধানমন্ত্রী দেবগৌড়ার কাছে 'ইতিবাচক' দৃষ্টিভঙ্গির আর্জি জানালেন। কিন্তু জম্মু-কাশ্মীরের সাধারণ নির্বাচন হওয়ার পরে পাকিস্তান নিজেই বেঁকে বসল। কাশ্মীর সমস্যা সমাধানের জন্য পাকিস্তান মার্কিন হস্তক্ষেপ দাবি করল। প্রত্যুত্তরে ভারত সীমান্ত সমস্যার সমাধানে মার্কিন হস্তক্ষেপ প্রত্যাখ্যান করল। সমস্যা মিটবে দ্বিপাক্ষিক বৈঠকেই—জানিয়ে দিল ভারত। **আই কে গুজরাল** প্রধানমন্ত্রী হবার পর কাশ্মীর সমস্যা সমাধানে আর এক দফা চেষ্টা চালানো হয়েছিল। গুজরাল আশা করেছিলেন, পাক প্রধামন্ত্রী নওয়াজ শরিফের সঙ্গে তাঁর বন্ধুত্বের সুবাদে কাশ্মীর সমস্যার সমাধান সহজ হবে। কিন্তু সে আশা অচিরেই বিনষ্ট হয়ে গেল।

অতঃপর ভারত-পাক সম্পর্ক তলানিতে এসে ঠেকল ১৯৯৮ সালের এপ্রিল মাস থেকে। ৬ এপ্রিল, ১৯৯৮, ১৫০০ কিলোমিটার দীর্ঘ পাল্লার ক্ষেপণাস্ত্র ঘৌরির পরীক্ষামূলক উৎক্ষেপণ সফল হল পাকিস্তানে। ১১ মে রাজস্থানে ভূগর্ভে তিনটি পরীক্ষামূলক **পরমাণু বিস্ফোরণ** ঘটাল ভারত। ১৩ মে ফের দুটি পরমাণু বিস্ফোরণ ঘটিয়ে ভারত ঘোষণা করল পরীক্ষামূলক বিস্ফোরণ শেষ। পাকিস্তান এর উত্তরে ২৮ মে ৫টি পরমাণু বিস্ফোরণ ঘটাল। ৩০ মে ফের একটি বিস্ফোরণ ঘটাল পাকিস্তান।

পরমাণু বিস্ফোরণ ঘটানোর এই মরিয়া প্রতিযোগিতা দেখে উপমহাদেশের মানুষ দারুণভাবে শঙ্কিত হয়ে পড়ে। অবশ্য এই টান টান উত্তেজনা কিছুদিনের জন্য প্রশমিত হয়। ১৯৯৮-এর ১০ জুলাই ভারত-পাকিস্তান উভয়েই একটি অহিংস চুক্তিতে সই করতে রাজি হল। ১৯৯৯-এর ২১ ফেব্রুয়ারি **প্রধানমন্ত্রী বাজপেয়ীর** ঐতিহাসিক লাহোর বাস-যাত্রা ঘটল। তৎকালীন পাক প্রধানমন্ত্রী নওয়াজ শরিফ স্বয়ং বললেন, সম্পর্কের বরফ গলছে।

কিন্তু কিছুদিনের মধ্যেই পরিস্থিতি আবার অগ্নিগর্ভ হয়ে উঠল। ১৯৯৯ সালের মে মাসে ভারত-পাকিস্তানের মধ্যে শুরু হল **কার্গিল যুদ্ধ**। মাস দুয়েক চলার পর ২৬ জুলাই সংঘর্ষের অবসান ঘটল।

১৯৯৯-এর অক্টোবরে পাক প্রধানমন্ত্রী নওয়াজ শরিফকে ক্ষমতাচ্যুত করে পারভেজ মুশারফ ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হলেন। সম্পর্ক স্বাভাবিক করার জন্য বাজপেয়ী নতুন করে উদ্যোগ নিলেন।

২০০১ থেকে ২০০৫ সালের মাঝামাঝি—এই সময়ের মধ্যে ভারত-পাক দ্বিপাক্ষিক সম্পর্কের উন্নতির ব্যাপারে অনেক পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে। দু'দেশের নেতারা পারস্পরিক মত বিনিময় করেছেন, শীর্ষ বৈঠকে মিলিত হয়েছেন, দু-দেশের ক্রিকেট দলের মধ্যে পারস্পরিক বন্ধুত্বপূর্ণ প্রতিযোগিতার আয়োজন করা হয়েছে। ২০০৪ সালে সাধারণ নির্বাচনের পর প্রধানমন্ত্রী মনমোহন সিং-এর নেতৃত্বে কেন্দ্রে UPA সরকার গঠনের পরও দু-দেশের মধ্যে সম্পর্কের উন্নতি ঘটানোর চেষ্টা অব্যাহত থাকে।

এ যাবৎ ভারত-পাকিস্তানের মধ্যে রাজনৈতিক রেষারেষির কারণে দু-দেশের মধ্যে বাণিজ্যিক সম্পর্ক অতি নিম্ন-পর্যায়ে আবদ্ধ ছিল। ২০০১-০২ সালের পর থেকে দু'দেশের মধ্যে বাণিজ্য ক্রমশ বাড়তে থাকে। পারমাণবিক অস্ত্র প্রতিযোগিতা থেকে উভয় দেশের কোনো লাভ হয়নি—এই বোধ থেকে তারা এখন থেকে নিজেদের মধ্যে অর্থনৈতিক আদানপ্রদান বাড়ানোর ব্যাপারে সক্রিয় হয়। ২০০৪-০৫ সালে দু-দেশের মধ্যে বাণিজ্যের পরিমাণ ছিল মাত্র ৫২১ মিলিয়ন মার্কিন ডলার, মাত্র তিন বছরের মধ্যে অর্থাৎ ২০০৭-০৮ সালে এর পরিমাণ দাঁড়ায় ২ বিলিয়ন মার্কিন ডলার। ২০০৮ সালের নভেম্বরে মুম্বাইয়ে সন্ত্রাসবাদী আক্রমণ দু-দেশের মধ্যে সম্পর্ককে একটা বিরাট ধাক্কা দিলেও বাণিজ্যিক লেনদেন আগের মতোই চলতে থাকে।

২০০৮-০৯ সাল নাগাদ ভারতের অর্থনৈতিক বিকাশ ভারতকে আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে একটা গুরুত্বপূর্ণ স্থানে পৌঁছে দেয়। এর বিপরীতে, পাকিস্তান ওই সময় অভ্যন্তরীণ রাজনৈতিক গণ্ডগোল, বৈদেশিক ঋণের বোঝা—এইসব কারণে চূড়ান্ত অর্থনৈতিক বিপর্যয়ের মধ্যে পড়ে। শুধু অর্থনৈতিক ক্ষেত্রেই নয়, ভারতের রাজনৈতিক ক্ষমতাও ওই সময় এতটাই সমৃদ্ধ হয় যে আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে ভারত অন্যান্য দেশের সমীহ আদায় করতে সমর্থ হয়ে ওঠে। এর একটা বড়ো প্রমাণ হল, ২০০৮ সালে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এবং পারমাণবিক শক্তি সরবরাহকারী গোষ্ঠী (NSG) ভারতের বিরুদ্ধে এতদিনকার নিয়ন্ত্রণ তুলে নেয় এবং ভারতের সঙ্গে অসামরিক পারমাণবিক বাণিজ্যে যুক্ত হয়।

প্রসঙ্গত অনুরূপ ব্যাপারে পাকিস্তানের আবেদনকে অগ্রাহ্য করা হয়। পাকিস্তান পরামাণবিক অস্ত্র সমৃদ্ধ দেশ হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হলেও, ভারতের সুসংহত অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক ক্ষমতার বিকাশ দুটি দেশের মধ্যে তাৎপর্যপূর্ণ পার্থক্য গড়ে তোলে। এই ব্যবধান পাকিস্তানকে দুটি বিকল্পের মুখোমুখি দাঁড় করিয়ে দেয়। একদিকে ভারতের সঙ্গে অর্থনৈতিক ও সামরিক দিক থেকে চ্যালেঞ্জ বজায় রাখতে গিয়ে সর্বস্বান্ত হওয়া, অন্যদিকে ভারতের সঙ্গে ঘনিষ্ঠতার সম্পর্ক গড়ে তুলে নিজের উন্নয়নকে সুনিশ্চিত করা। দেখা যায় পাকিস্তান অনিচ্ছা সত্ত্বেও দ্বিতীয় বিকল্পটির দিকে ঝুঁকতে শুরু করেছে।

২০১৪ সালে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী ক্ষমতায় আসার পর দু-দেশের সম্পর্ক যথারীতি আগের পথ ধরেই চলতে থাকে। **ভাজিরাম এবং রবি** (Vajiram and Rabi)-র ভাষায় মোদী সরকার ক্ষমতায় আসার পর থেকে ভারত-পাক সম্পর্ক পূর্বের মতোই পরিচিত পথ ধরেই এগোতে থাকে, যেখানে দেখা যায় সাময়িকভাবে দুটি দেশ ঘনিষ্ঠ হওয়ার দিকে এগিয়ে যাওয়ার পরই এই সম্পর্কের উষ্ণতা এক হিমশীতল অবস্থার মধ্যে ডুবে যায়, যার পরে পরেই ঘটে পাকিস্তানের মদতপুষ্ট সন্ত্রাসবাদী গোষ্ঠীগুলির বড়ো রকমের ভারত আক্রমণ ("Since the coming to power of Modi Government, India-Pakistan relations have been marked by the familiar trend of periodic short warmth followed by extended chill in bilateral ties in wake of a major terrorist attack in India formented by Pakistan based terrorist groups."–Vajiram and Ravi, *International Relations*)।

ভারত-পাকিস্তানের মধ্যে সম্পর্কের অচলাবস্থা সাময়িকভাবে প্রশমিত হয় ২০১৫ সালের ডিসেম্বরে ভারতের বিদেশ মন্ত্রী সুষমা স্বরাজ ইসলামাবাদে অনুষ্ঠিত 'Heart of Asia Conference'-এ যোগদানকালে। দীর্ঘ তিন বছর পর এটিই প্রথম ভারতের কোনো বিদেশ মন্ত্রীর পাকিস্তান পরিদর্শন। শ্রীমতী স্বরাজ ও পাকিস্তানের পররাষ্ট্র বিষয়ক পরামর্শদাতা এস আজিজ (Sartaj Azia) একটি যুগ্ম প্রতিবেদনে সন্ত্রাসবাদকে নিন্দা করেন এবং এটিকে নির্মূল করার ব্যাপারে প্রস্তাব গ্রহণ করেন। এই যুগ্ম প্রতিবেদনে আরও বলা হয়, পাকিস্তান মুম্বাই হত্যাকাণ্ডের অবিলম্বে সুষ্ঠু বিচার চায়। এর ঠিক পরে পরেই মস্কো এবং কাবুল থেকে ফেরার পথে ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী হঠাৎ করেই লাহোরে গিয়ে হাজির হন। প্রসঙ্গত ২০০৪ সালে বাজপেয়ীর পর এই প্রথম ভারতের প্রধানমন্ত্রীর পাকিস্তান পরিদর্শন। উভয়দেশের প্রধানমন্ত্রীদ্বয় দ্বিপাক্ষিক আলোচনায় উভয় দেশের মধ্যে, বিশেষ করে উভয় দেশের জনসাধারণের মধ্যে সম্পর্কের উন্নতি ঘটানোর ওপর গুরুত্ব আরোপ করেন।

কিন্তু সমস্ত আশায় জল ঢেলে দেয় সন্ত্রাসবাদী গোষ্ঠীগুলি। ২০১৬ সালে পাকিস্তানি মদতপুষ্ট সন্ত্রাসবাদী গোষ্ঠী পরপর দুটি বড়ো রকমের আক্রমণ ঘটায় ভারতের ওপর—একটি পাঠানকোট এয়ার ফোর্সের ওপর, অপরটি উরি (Uri) সামরিক শিবিরের ওপর। এই ধরনের উপর্যুপরি সন্ত্রাসবাদী আক্রমণকে ভারত কড়াভাবে নিন্দা করে এবং যতপ্রকারে সম্ভব পাকিস্তানকে ধিক্কার জানায় ও পৃথিবীর সমস্ত আন্তর্জাতিক সংগঠন থেকে বিচ্ছিন্ন করার চেষ্টা করে ("India adopted the strategy of an all-out diplomatic blitz to name, shame and isolate Pakistan at various global platforms"–Vajiram and Ravi)।

অন্যদিকে পাকিস্তানও হাত গুটিয়ে বসে থাকেনি। সেও ভারতের বিরুদ্ধে বিশ্বব্যাপী প্রচার শুরু করে দেয়, ভারতের অপর এক প্রতিদ্বন্দ্বী দেশ চিনের সঙ্গে সখ্যতা বাড়ায়। ইতিমধ্যে বালুচিস্তান ইস্যুকে নিয়ে প্রধানমন্ত্রী মোদীর মন্তব্যকে পাকিস্তান নিজের অনুকূলে বিশ্বজনমতকে আনার একটা সুযোগ হিসেবে নিয়েছে। এই পরিস্থিতিতে পাকিস্তান নতুন উদ্যমে জম্মু-কাশ্মীর ইস্যুকে আন্তর্জাতিক স্তরে নিয়ে যাওয়ার একটা সুযোগ পেয়ে যায়।

উপসংহার : সুতরাং দেখা যাচ্ছে, এই মুহূর্তে দু-দেশের মধ্যে সম্পর্কের উন্নতি ঘটানোর কোনো সম্ভাবনা দেখা যাচ্ছে না। যখনই কোনো গতিশীলতার সঞ্চার হয়েছে, তখনই তাকে সঙ্গে সঙ্গে থামিয়ে দেওয়া হয়েছে। তাই সাফল্যের পরেই এসেছে গভীর হতাশা। প্রকৃতপক্ষে ভারত-পাকিস্তান মৈত্রী খোঁজার কাজ রূপকথার 'সিসিফাস'-এর কাজের থেকেও কঠিন, যে সিসিফাস পাহাড় বেয়ে ভারী পাথর কিছুটা তোলার পর সেটি যথারীতি নীচে গড়িয়ে পড়ত।

সঙ্গে বৈঠক করেন। আশা করা যায়, উভয় দেশের এই ইতিবাচক মনোভাবের পরিণতিতে দুটি দেশের সম্পর্কের উন্নতি ঘটবে।

৭.১১ ভারত ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র
India and the USA

ভারত ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের মধ্যে সম্পর্কের সূত্রপাত ভারত স্বাধীন হওয়ার সময় থেকেই। তবে এই দুটি দেশের মধ্যে সম্পর্ক খুব বেশিদিন এক খাতে প্রবাহিত হয়নি। দু-দেশের সম্পর্কের মধ্যে ঘটেছে নানান চড়াই-উতরাই।

ভারত স্বাধীন হওয়ার অব্যবহিত পরেই কাশ্মীরকে কেন্দ্র করে পাকিস্তানের সঙ্গে ভারতের চরম মতপার্থক্য শুরু হয়ে যায়। কাশ্মীর প্রশ্নে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র প্রথম থেকেই পাকিস্তানকে সমর্থন জানিয়ে গেছে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র কোনোদিনই পাকিস্তানকে কাশ্মীরের ব্যাপারে আক্রমণকারী দেশ রূপে চিহ্নিত করেনি। পুরস্কারস্বরূপ পাকিস্তান সরকার পাক-অধিকৃত কাশ্মীরের গিলগিটে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রকে সামরিক ঘাঁটি স্থাপনের অনুমতি দিয়েছে। সামরিক এবং কৌশলগত (Strategic) দিক থেকে ভারত উপমহাদেশ বরাবরই মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের কাছে ভীষণ গুরুত্বপূর্ণ। এই কাশ্মীর সমস্যা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রকে এই অঞ্চলের ব্যাপারে নাক গলানোর তথা প্রভাব বিস্তারের একটা সুযোগ করে দেয়।

পাকিস্তান ও ভারতের মধ্যে দ্বৈরথে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের পাকিস্তানের পক্ষ নেওয়ার পিছনে আরও অনেক কারণ ছিল। সেগুলির মধ্যে অন্যতম হল, পাকিস্তান যেখানে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের মুখাপেক্ষী হয়ে আন্তর্জাতিক সমস্যার বিচার বিশ্লেষণ করত এবং সিদ্ধান্ত নিত, ভারত তার জায়গায় আন্তর্জাতিক বিষয়ে স্বাধীন ও নিরপেক্ষভাবে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছে এবং জোটনিরপেক্ষ নীতি অনুসরণ করে চলেছে। তা ছাড়া ভারত মুখে জোটনিরপেক্ষতার কথা বললেও কার্যত অনেক বিষয়েই কমিউনিস্ট জোটের প্রতি পক্ষপাতিত্ব দেখিয়েছে। ১৯৪৯ সালে চিনে কমিউনিস্ট শাসন প্রতিষ্ঠিত হলে ভারতই প্রথম তাকে স্বীকৃতি জানিয়েছে। শুধু তাই নয় গণপ্রজাতন্ত্রী চিন যাতে সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের সদস্যপদ অর্জন করতে পারে, সে ব্যাপারে ভারতই সবচেয়ে সক্রিয় ভূমিকা নিয়েছে। তা ছাড়া কোরিয়া যুদ্ধে ভারত মার্কিন নীতির বিরোধিতা করেছে। ওই সময় চিন-ভারত মৈত্রী স্থাপন, পঞ্চশীল এবং বান্দুং সম্মেলনের সাফল্য প্রভৃতি ঘটনাও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রকে ভারত বিরোধী করে তুলতে ইন্ধন জুগিয়েছে।

১৯৬২ সালে চিন-ভারত সীমান্ত বিরোধের সময় মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র অবশ্য কট্টর ভারত-বিরোধী অবস্থান থেকে কিছুটা সরে এসেছে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ভারতের প্রতি সহানুভূতি ও শুভেচ্ছা জ্ঞাপন করেছে। তা ছাড়া ১৯৬৫ সালের সেপ্টেম্বরে পাকিস্তান কাশ্মীরের নিয়ন্ত্রণরেখা অতিক্রম করে ভারতের ওপর আক্রমণ শুরু করলে, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র কোনো পক্ষ অবলম্বন করেনি, নিরপেক্ষ থেকেছে। ১৯৬৫ সালের যুদ্ধের পরে পরেই ভারত চরম খাদ্য সংকটের মধ্যে পড়ে। ওই সময় PL 480 অনুসারে খাদ্যশস্য সরবরাহ করে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ভারতের পাশে এসে দাঁড়ায়। ১৯৬৬ সালে প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধি মার্কিন সফরে যান। ১৯৬৬ সালের জুনে সম্পাদিত একটি চুক্তির ফলে মার্কিন সরকার ভারতকে ৪৮.৮ মিলিয়ন ডলার ঋণ দেয়। শুধু তাই নয়, ১৯৬৮ সালে মার্কিন রাষ্ট্রপতি জনসন বিশ্বের অন্যান্য সম্পদশালী দেশকেও যুক্তিসংগত শর্তে ভারতকে বৈদেশিক মুদ্রা সরবরাহ করতে অনুরোধ জানান। ১৯৬৯ সালে মার্কিন রাষ্ট্রপতি নিকসন ভারত সফরে এলে উভয় দেশের মধ্যে সুসম্পর্কের নতুন আলো দেখা দেয়।

তবে সেই আশার আলো অচিরেই নিভে যায় এবং উভয় দেশের মধ্যে সম্পর্কের অবনতি ঘটতে থাকে। এর অন্যতম প্রধান কারণ হল ভারত ও সোভিয়েত রাশিয়ার মধ্যে ১৯৭১ সালে সম্পাদিত মৈত্রী চুক্তি। এই চুক্তি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রকে পুনরায় ভারত বিদ্বেষী করে তোলে। ১৯৭১ সালের ১ ডিসেম্বর পাকিস্তান বিনা প্ররোচনায় ভারত আক্রমণ করলে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র পাকিস্তানকে নিন্দা করা দূরে থাক, উলটে পাকিস্তানকেই সমর্থন জানায় এবং নানাভাবে পাকিস্তানকে সাহায্য করতে থাকে। উপরন্তু, ভারতকে সবরকম আর্থিক সাহায্য প্রদান বন্ধ করে দেয় মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র। এর পরবর্তী কয়েকটি ঘটনাও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রকে প্রচণ্ডভাবে ভারতবিরোধী করে তোলে,

যেমন—(ক) ১৯৭৪ সালে রাজস্থানের পোখরানে ভারতের সফল আণবিক বিস্ফোরণ, (খ) ১৯৭০-এর দশকে সংঘটিত পারমাণবিক অস্ত্রপ্রসার রোধ চুক্তিতে (NPT) স্বাক্ষর করতে ভারতের অসম্মতি, (গ) ১৯৭৭ সালে ক্ষমতাসীন নতুন জনতা সরকারের সোভিয়েত ঘেঁষা নীতি অনুসরণ, (ঘ) ১৯৭৫ সালে ভারত সরকার কর্তৃক অভ্যন্তরীণ জরুরি অবস্থা ঘোষণা ইত্যাদি। এসবের প্রতিক্রিয়া স্বরূপ ১৯৭৮ সালে মার্কিন সরকার ভারতের পরমাণু কর্মসূচির ওপর নিষেধাজ্ঞা জারি করে, ভারতের তারাপুর পরমাণু শক্তি উৎপাদন কেন্দ্রে পরমাণু জ্বালানি সরবরাহ বন্ধ করে দেওয়ার সিদ্ধান্ত নেয়। অন্যদিকে, মার্কিন সরকার নতুন করে পাকিস্তানকে অস্ত্রসজ্জায় সজ্জিত করে তোলার সিদ্ধান্ত নেয়।

১৯৭৮ সালে উভয় দেশের তরফ থেকে পারস্পরিক সম্পর্কের উন্নতি ঘটাবার চেষ্টা করা হয়। যেমন ওই বছর জানুয়ারিতে মার্কিন রাষ্ট্রপতি জিমি কার্টার ভারত সফরে আসেন এবং একই বছর ভারতের প্রধানমন্ত্রী মোরারজি দেশাই-মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র সফরে যান। ১৯৮১ সালে মার্কিন রাষ্ট্রপতি রোনাল্ড রেগন এবং ভারতের প্রধানমন্ত্রী নতুন উদ্যমে দু-দেশের মধ্যে সম্পর্কের উন্নতি ঘটাতে প্রয়াসী হন। এই উদ্যোগের ফলস্বরূপ উভয় দেশেই বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিক্ষেত্রে সহযোগিতামূলক গবেষণার সূত্রপাত ঘটে। ১৯৮২ সালের জুলাই মাসে ভারতের প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধি ৯ দিনের মার্কিন সফরের মাধ্যমে উভয় দেশের মধ্যে সহযোগিতা ও বোঝাপড়া প্রসারের পথ প্রশস্ত হয়। একই সঙ্গে তিনি (ইন্দিরা গান্ধি) পাকিস্তানকে ক্রমবর্ধমান হারে মার্কিন অস্ত্র সরবরাহের বিরুদ্ধে তীব্র প্রতিবাদ জ্ঞাপন করতে ভোলেননি। এর উত্তরে মার্কিন প্রশাসন জানিয়ে দেয় যে, ভারতও প্রয়োজন মনে করলে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের কাছ থেকে সামরিক সম্ভার কিনতে পারে।

১৯৮০-র দশকের মাঝামাঝি রাজীব গান্ধি প্রধানমন্ত্রী হওয়ার পর ভারতের অর্থনীতিতে উদারীকরণের সূচনা ঘটে। ফলে ভারত-মার্কিন বাণিজ্য একটা গতি পায়। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ভারতকে উচ্চ পর্যায়ের প্রযুক্তি সরবরাহের ব্যাপারে চুক্তিবদ্ধ হয়। ভারতের অর্থনীতিতে এই উদারীকরণ নীতি আরও জোরদার হয় ৯০-এর দশকের শুরু থেকে। ইতিমধ্যে সোভিয়েত ইউনিয়ন সহ সমাজতান্ত্রিক দুনিয়ার বিপর্যয় আন্তর্জাতিক পরিস্থিতিকে বিপুলভাবে পালটে দেয়। বলা বাহুল্য এই পরিবর্তন মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও তার অনুগামী দেশগুলির অনুকূলে যায়। ভারতের কাছে জোটনিরপেক্ষ নীতি ক্রমশ অপ্রাসঙ্গিক হয়ে উঠতে থাকে। ভারত পরিষ্কার বুঝে যায়, আগামী দিনে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা বাড়ানো ছাড়া ভারতের গত্যন্তর নেই। পরিস্থিতির সঙ্গে তাল রেখে ভারত ক্রমশই মার্কিন ঘেঁষা নীতি অনুসরণ করতে থাকে। ভারত সরকার ঘোষিত অর্থনৈতিক সংস্কার কর্মসূচি, ১৯৯১ সালের নয়া শিল্পনীতি, বিশ্বায়ন, অবাধ বাণিজ্য নীতি, ভরতুকি বন্ধের মার্কিন প্রস্তাব গ্রহণ, বিশ্বব্যাংক ও আন্তর্জাতিক অর্থভাণ্ডারের ঘোষিত নয়া নীতির প্রতি ভারতের সমর্থন ইত্যাদি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র সহ অন্যান্য পুঁজিবাদী দেশগুলিকে সন্তুষ্ট করেছে। ক্রমে ভারত-মার্কিন বন্ধুত্বের ক্ষেত্রটি প্রশস্ত হয়েছে। ১৯৯১-৯২ সালের মধ্যে ভারত মার্কিন সম্পর্ক ঘনিষ্ঠতর হওয়ার কয়েকটি নজির হল : নিরাপত্তা পরিষদের শীর্ষ বৈঠকে ভারতের প্রধানমন্ত্রী রাজীব গান্ধির সঙ্গে মার্কিন রাষ্ট্রপতি জর্জ বুশের সাক্ষাৎকার, প্রতিরক্ষা সংক্রান্ত ক্ষেত্রে ভারত-মার্কিন সহযোগিতা, প্রযুক্তির বিকাশে মার্কিন বিনিয়োগ বৃদ্ধি, ভারতের পররাষ্ট্রমন্ত্রীর সঙ্গে মার্কিন পররাষ্ট্র সচিব জেমস বেকারের দ্বিপাক্ষিক সমস্যা নিয়ে আলোচনা, ১৯৯১ সালে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র কর্তৃক ভারতকে 'অগ্রাধিকার বিশিষ্ট দেশ' (Priority Foreign Country) ঘোষণা ইত্যাদি। ১৯৯১ সালে ভারত-মার্কিন দ্বিপাক্ষিক বাণিজ্যের পরিমাণ ছিল ৫.২ বিলিয়ন মার্কিন ডলার। ২ বছরের মধ্যে তার পরিমাণ দাঁড়ায় ৭.৩ বিলিয়ন মার্কিন ডলারে। ১৯৯৩ সালে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে ভারতের রপ্তানি ২০ শতাংশ বৃদ্ধি পায় ; অন্যদিকে ভারতে মার্কিন পণ্যের আমদানি বাড়ে ৪০ শতাংশ। ১৯৯৪ সালে ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরসিমা রাও মার্কিন সফরে গেলে ভারত-মার্কিন সম্পর্ক আরও একধাপ এগোয়। ক্ষমতায় আসার পর রাও সরকার অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে যেসব সংস্কার কর্মসূচি গ্রহণ করে, তাতে মার্কিন সরকার যথেষ্ট উৎসাহিত হয় এবং ১৯৯৫ সালের জানুয়ারি মাসে ভারত-মার্কিন বাণিজ্যিক জোট (US-India Commercial Alliance) গঠন করা হয়। এই বছরই জুলাই মাসে মার্কিন সরকার ভারতকে 'বৃহৎ সম্ভাবনাময় বাজার' (Big Emerging Market) হিসেবে স্বীকৃতি দেয়।

মনে রাখতে হবে, ভারত-মার্কিন সম্পর্ক দীর্ঘদিন একটানা বন্ধুত্বের থাকেনি। ভারতের শত্রুদেশ পাকিস্তানের প্রতি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের দুর্বলতা, কাশ্মীর সমস্যা, পারমাণবিক অস্ত্র প্রসার রোধ চুক্তিতে (NPT) ভারতের স্বাক্ষর না করা, ভারতের অগ্নি ও পৃথ্বী রকেট উৎক্ষেপণ—এসবের প্রেক্ষিতে দু-দেশের সম্পর্ক পুনরায় অবনতির দিকে এগোতে থাকে। ১৯৯৫ সালে মার্কিন সরকার তার পুরানো নিষেধাজ্ঞা তুলে নিয়ে পুনরায় পাকিস্তানকে সামরিক ও অর্থনৈতিক সাহায্যদানের প্রস্তাব অনুমোদন করে। ওই বছর ৭এপ্রিল মার্কিন কংগ্রেসের ৩০ জন সদস্য একটি বিল উত্থাপনের মাধ্যমে ভারতকে সাহায্যদানের ক্ষেত্রে মানবিক অধিকার রক্ষার শর্ত আরোপের দাবি জানায়। এ ছাড়া ওই সময় ভারতীয় স্টিলের ওপর চড়া হারে আমদানি শুল্ক ধার্য করে মার্কিন সরকার।

তবে সন্ত্রাসবাদ মোকাবিলাকে কেন্দ্র করে ভারত-মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র একে অন্যের দিকে সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দিয়েছে। ১৯৯৭ সালে সন্ত্রাসবাদ মোকাবিলার উদ্দেশ্যে একটি যুগ্ম কমিটি গঠন করা হয়। ২০০০ সালে মার্কিন রাষ্ট্রপতি ক্লিনটন ভারত সফরে আসেন এবং ওই বছরই ভারতের প্রধানমন্ত্রী অটলবিহারী বাজপেয়ী মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে যান। সফর শেষে উভয় দেশ সন্ত্রাসবাদ দমন, অস্ত্র নিয়ন্ত্রণ, এড্‌স প্রতিরোধ প্রভৃতি বিষয়ে পারস্পরিক সহযোগিতার সংকল্প নিয়ে যৌথ বিবৃতি প্রকাশ করে। ২০০১ সালের ১১সেপ্টেম্বর মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ওপর বিধ্বংসী সন্ত্রাসবাদী আক্রমণের প্রেক্ষিতে দু-দেশের মধ্যে সহযোগিতার সম্পর্ক দৃঢ় হয়। সন্ত্রাসবাদ দমনের উদ্দেশ্যে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র আফগানিস্তানকে আক্রমণ করলে, ভারত তা সমর্থন করে। তবে ওই সময় ভারত চেয়েছিল, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র পাকিস্তানকে 'সন্ত্রাসবাদী রাষ্ট্র' হিসেবে চিহ্নিত করুক। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র তার স্নেহধন্য পাকিস্তানের বিরুদ্ধে এই ধরনের পদক্ষেপ নিতে অস্বীকার করলে ভারত মার্কিন নীতির কঠোর সমালোচনা করে।

ভারতের পরবর্তী প্রধানমন্ত্রী মনমোহন সিং-এর আমলে ভারত মার্কিন সম্পর্ক একধাপ এগোয়। ২০০৫ সালে প্রধানমন্ত্রী মনমোহন সিং মার্কিন সফরে গেলে দু-দেশের মধ্যে অসামরিক পরমাণু চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। এর কিছুদিন পর তিনটি গুরুত্বপূর্ণ ক্ষেত্রে ভারত-মার্কিন সহযোগিতার সম্পর্ক আরও মজবুত হয়; ক্ষেত্রগুলি হল জ্বালানি শক্তি (Energy), সামরিক ক্ষেত্র এবং অর্থনৈতিক ক্ষেত্র। ২০০৬ সালে মার্কিন রাষ্ট্রপতি জর্জ বুশ ভারত সফরে এলে দু-দেশের সম্পর্ক আরও একধাপ এগোয়। উক্ত সফরকালে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র অসামরিক ক্ষেত্রে ব্যবহারের জন্য ভারতকে পরমাণু জ্বালানি সরবরাহ করার প্রতিশ্রুতি দেয়।

২০০৫ সালে ওয়াশিংটন ডি. সি. এবং ২০০৬ সালে নতুন দিল্লিতে ভারতের প্রধানমন্ত্রী মনমোহন সিং এবং মার্কিন রাষ্ট্রপতি জর্জ বুশের মধ্যে যে শীর্ষবৈঠক দুটি সম্পন্ন হয়, তার মধ্য দিয়ে দু-দেশের মধ্যে সম্পর্কের নিবিড়তা প্রকাশিত হয়। বিশ্বের দুটি বৃহত্তম গণতন্ত্রের নেতৃবৃন্দ বিশ্বব্যাপী সুস্থিতি, গণতন্ত্র, আইনের অনুশাসন, মানুষের স্বাধীনতা, সমৃদ্ধি এবং শান্তি প্রতিষ্ঠায় অঙ্গীকারবদ্ধ হয়। ইতিপূর্বে ২০০০ সালে রাষ্ট্রপতি বুশের নির্বাচনি প্রচারের সময় তাঁর বিদেশনীতি বিষয়ক পরামর্শদাতা ভারতকে দক্ষিণ-এশীয় একটি দেশ হিসেবে এবং ক্ষমতার ভারসাম্যের নিরিখে বিচার করার সাবেকি দৃষ্টিভঙ্গিকে পরিত্যাগ করে নতুনভাবে দেখার ওপর গুরুত্ব আরোপ করেন। ২০০২ সালে বুশ প্রশাসনের জাতীয় নিরাপত্তা স্ট্র্যাটেজিতে প্রথম ভারতকে একটি বিশ্বশক্তির পর্যায়ে ফেলা হয়। ২০০৪ সালে US National Intelligence কর্তৃক প্রকাশিত প্রতিবেদনে পুনরায় ভারতকে (এবং চিনকে) উদীয়মান বিশ্বশক্তি হিসেবে চিহ্নিত করা হয়।

২০০৪ সালের ডিসেম্বরে দক্ষিণ এবং দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়াতে যে বিধ্বংসী 'সুনামি' হয়, তা ভারত ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের নৌশক্তিকে আরও কাছাকাছি আসার সুযোগ করে দেয়। এ ছাড়াও ওই সময়ে দু-দেশের মধ্যে হাই-টেক বাণিজ্য, মহাকাশ সংক্রান্ত এবং বিমান পরিসেবা সংক্রান্ত যেসব চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়, তার মধ্য দিয়ে সম্পর্কের গভীরতা ক্রমশ সুস্পষ্ট হতে থাকে। ২০০৬ সালে মার্কিন রাষ্ট্রপতি বুশের ভারত সফরকালে যে সমুদ্রসংক্রান্ত যৌথ কর্মসূচি (Maritime Cooperation Framework) গৃহীত হয়, দু-দেশের মধ্যে সম্পর্কের ওপর তার প্রভাবও কম ছিল না। এই কর্মসূচির লক্ষ্য ছিল উভয় দেশ যৌথভাবে সমুদ্রে নিরাপত্তার ব্যবস্থা সুনিশ্চিত করবে, জলদস্যুদের ক্রিয়াকলাপ এবং অতিজাতীয় (Transnational) অপরাধ দমন করবে, সমুদ্রের জল দূষণ রোধ করবে, প্রাকৃতিক বিপর্যয় মোকাবিলা করবে। ওই সময়ে দু-দেশের মধ্যে অর্থনৈতিক লেনদেনের মাত্রাও সর্বকালীন রেকর্ডকে ছাড়িয়ে যায়। বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির ক্ষেত্রেও দু-দেশের মধ্যে গুরুত্বপূর্ণ চুক্তি স্বাক্ষরিত

হয়েছে। শিক্ষা ও গবেষণা ক্ষেত্রেও দু-দেশের মধ্যে ঘনিষ্ঠতা বেড়ে যায়। ওই সময় ভারত থেকে বহু ছাত্রছাত্রী উচ্চশিক্ষা এবং গবেষণার জন্য মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে যায়।

ভারত-মার্কিন দ্বিপাক্ষিক সম্পর্কের ক্ষেত্রে ২০০৮ সালটি একটি বিশেষ বছর (Turning point) হিসেবে চিহ্নিত হওয়ার দাবি রাখে। ২০০৫ সালে মনমোহন সিং-এর মার্কিন সফরকালে যে অসামরিক পারমাণবিক চুক্তিটি স্বাক্ষরিত হয়, ২০০৮ সালে তা মার্কিন কংগ্রেসের অনুমোদন লাভ করে। এই গুরুত্বপূর্ণ চুক্তিতে বলা হয়, ভারত তার অসামরিক পরমাণু কর্মসূচি নিয়ন্ত্রণ করবে আন্তর্জাতিক অ্যাটোমিক এনার্জি এজেন্সি (IAEA) কর্তৃক নির্দেশিত রক্ষাকবচ অনুযায়ী, পরমাণু অস্ত্র পরীক্ষা কর্মসূচি সমর্থন করবে, পরমাণু বিষয়ক দ্রব্যাদি রপ্তানি বন্ধ করবে। পরিবর্তে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রও ভারতকে একটি পারমাণবিক অস্ত্র সমৃদ্ধ দেশ হিসেবে প্রয়োজনীয় স্বীকৃতি জানাবে, ভারতকে পর্যাপ্ত পারমাণবিক জ্বালানি সরবরাহ করবে, দুটি দেশ মিলিতভাবে বৃহৎ অসামরিক পারমাণবিক কর্মসূচি গড়ে তুলবে—এইসব প্রতিশ্রুতি দেয়। ২০১০ সালে পরবর্তী মার্কিন রাষ্ট্রপতি বারাক ওবামার ভারত সফরকালেও এই প্রতিশ্রুতি পালনের অঙ্গীকার দেওয়া হয়। রাষ্ট্রপতি ওবামা ভারতকে শুধু বন্ধু দেশ ('ally') হিসেবে না দেখে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের একটি অপরিহার্য অংশীদার (Indispensable partner) হিসেবে দেখতে চেয়েছিলেন। ভারতের বিশাল বাজার মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের কাছে অতীব আকর্ষণীয় বিষয়। ভারতেরও প্রয়োজন মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রকে কারণ এই ভারতে মার্কিন বিনিয়োগ যত বাড়বে, ভারতের অর্থনীতি তত সমৃদ্ধ হবে। এ ছাড়া মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের বাজার, তাদের উন্নত প্রযুক্তি, প্রতিরক্ষা সরঞ্জাম, বিভিন্ন ক্ষেত্রে তাদের সৃষ্টিশীলতা এসবেরও প্রয়োজন রয়েছে ভারতের। ২০১০ সালের ৮ নভেম্বর ভারতীয় সংসদে বক্তৃতাদানকালে মার্কিন রাষ্ট্রপতি ওবামা সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের নিরাপত্তা পরিষদে ভারতের একজন স্থায়ী সদস্য হওয়ার দাবিকে দৃঢ়ভাবে সমর্থন করেন। এর উত্তরে ভারতও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের প্রতি বিভিন্ন বিষয়ে, বিশেষ করে সন্ত্রাসবাদ দমনে, সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দেবার অঙ্গীকার করে। আশা করা যায়, ভারত-মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের এই সম্পর্ক আগামী দিনে আরও গভীর ও দৃঢ় হয়ে উঠবে।

৭.১২ ভারত ও চিন